শ্রেণী সম্পর্কিত মার্ক্সীয় ধারণা **(Marxist Interpretation of Class)**

মার্ক্সীয় দর্শনে শ্রেণীর ধারণা হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণী হল মার্ক্সবাদের অন্যতম একটি মৌলোক ধারণা। শ্রেণীর ধারণা থেকে মার্ক্সীয় দর্শনের সূত্রপাত। মার্ক্সীয় দর্শনে শ্রেণী হল একটি বিশেষ বিন্দু। এই বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত ও কার্যকর হয় অর্থনীতি, রাজনীতি ও ভাবাদর্শমূলক বিভিন্ন কাঠামো। মার্ক্সই প্রথম প্রলেতারীয় শ্রেণী বা সর্বহারা শ্রেণীর কথা বলেছেন। এই সর্বহারা শ্রেণীই হল সমাজের সক্রিয় শক্তি এবং নতুন মূল্যবোধ ও সভ্যতার সংবাহ। এই শ্রেণীই এখনকার সমাজের গঠনমূলক বাস্তব উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়।

মার্ক্সীয় দর্শন অনুসারে শ্রেণীগত পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া মানসমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের বিচার-বিশ্লেষণ অসম্ভব। কমিউনিষ্ট ইস্তেহারে এঙ্গেল্‌স বলেছেন, 'মানুষের ইতিহাস হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস, এই সংগ্রাম; শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে, সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে শাসক ও শাসিত শ্রেণীর মধ্যে।' বস্তুত মার্ক্সীয় দর্শনে শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক পার্থক্য সৃষ্টি হয় যখন বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে। জাতি-ধর্ম, নারী-পুরুষ, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি ভেদে সমাজস্থ ব্যক্তবর্গের মধ্যে নানা পার্থক্য আছে। এই সকল পার্থক্যের মধ্যে সামাজিক পার্থক্যই হল সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মার্ক্সবাদে সামাজিক শ্রেণীর আবির্ভাব ও অবসান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মার্ক্সের মতে সমাজে শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাকে কেন্দ্র করে। শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে নির্দিষ্ট একটি উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে অর্থাৎ মার্ক্সের অভিমত অনুসারে সামাজিক শ্রেণীর বিষয়টি শাশ্বত বা চিরন্তন নয়।

ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটলে শ্রেণীরও অবসান ঘটবে। মার্ক্সবাদী বক্তব্য অনুসারে মানব-ইতিহাসের বিকাশের ধারা উৎপাদনশক্তির বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। উৎপাদন শক্তির ক্রমবিকাশের ধারায় বিশেষ একটি পর্যায়ে সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বা সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি হয়। এই সময়ে সমাজ সম্পত্তির মালিক শ্রেণী ও সম্পত্তির মালিকানাহীন শ্রেণী - এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই দুটি শ্রেণী পরস্পরবিরোধী। এদের শোষক ও শোষিত শ্রেণীও বলা হয়। দাস-সমাজব্যবস্থাতেই প্রথম ব্যক্তিগত সম্পত্তির এবং দাস-মালিক ও ক্রীতদাস - এই দুটি পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। উৎপাদনশক্তিই ক্রমশঃ বিকশিত হয় এবং উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন সাধন করে। এইভাবে একধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে আর এক ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থায় সমাজব্যবস্থার উত্তরণ ঘটে।

মার্ক্স-এর মতে শ্রেণীর সংজ্ঞা

মার্ক্সীয় সমাজ-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'শ্রেণী'ই হল মুখ্য উপাদান এবং ইতিহাসের চালিকা শক্তি হল শ্রেণীসংগ্রাম। মার্ক্সীয় দৃষ্টভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী হল এক আর্থসামাজিক সত্তা। উৎপাদন-উপাদনের সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির শ্রেণী নির্ধারিত হয়। ব্যক্তির শ্রেণীগত অবস্থান নির্ভর করে সামাজিক উৎপাদন-উপাদানের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক এবং সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তির অবস্থানের ওপর। মার্ক্সবাদে সামাজিক শ্রেণীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে উৎপাদনের উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে। মার্ক্সবাদে ব্যক্তির মানসিকতা এবং আয় ও অভ্যাসের তারতম্যকে শ্রেণীগত পার্থক্যের উৎস বা সামাজিক শ্রেণী নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হয়।

মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স ব্যাপকভাবে ‘শ্রেণী’ কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁরা কোথাও এর সংজ্ঞা দেন নি। মার্ক্স দুটি যুযুধান মূল শ্রেণীর কথা বলেছেন। এ দুটি শ্রেণী হল বুর্যোয়া ও প্রলেতারিয়েত। অধ্যাপক আশারফ ও শর্মা (Asharof & Sharma) এই প্রসঙ্গে বলেন, "The concept of conflict is essential to Marx’s philosophy of dialectical materialism. Classes are pitted against each other with the owning class exploiting the dispossessed class'। সকল উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর বণ্টন বুর্জোয়াদের নিয়ন্ত্রণাধীন। জীবনধারণের জন্য বুর্জোয়াদের কাছে শ্রম বিক্রি করতে প্রলেতারিয়েতেরা বাধ্য হয়। প্রধান দুটি শ্রেণী ছাড়া মার্ক্স সমাজে অন্যান্য শ্রেণীর অস্তিত্বের কথাও বলেছেন। যেমন, সমাজে পাতি বুর্জোয়া(Petty bourgeoisie) ও কৃষক শ্রেণী থাকে।

তবে বিপ্লবের ক্ষেত্রে এদের কোন ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেন নি। তা ছাড়া ক্ষেতমজুর, বুদ্ধিজীবি ও লুম্পেন প্রলেতারিয়েত (Lumpen Proletariat) শ্রেণীর কথাও তিনি বলেছেন। মার্ক্স তাঁর Class struggle in France গ্রন্থে চোর, অপরাধী, ভবঘুরে প্রভৃতি ইতরশ্রেণীর লোকেদের লুম্পেন প্রলেতারিয়েত হিসাবে চিহ্নিত করেন। এরা রীতিমত প্রতিক্রিয়াশীল এবং সমাজের প্রগতিতে এদের কোন ভূমিকা নেই।

মার্ক্সের মতে সমাজ গতিশীল। এই গতিশীল সমাজে কোন শ্রেণী চিরদিন একই রকম থাকতে পারে না। শ্রেণী সম্পর্কীত মার্ক্সীয় ধারণার মধ্যে একটি মনোগত বা পরিবর্তনশীল উপাদান পরিলক্ষিত হয়।

শ্রেণী সম্পর্কিত আলোচনাতে মার্ক্স 'Class in itself' এবং 'Class for itself' এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কোন জনগোষ্ঠী নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে এবং সুসংগঠিত হতে না পারলে শ্রেণীতে পরিণত হয় না। শ্রেণীতে পরিণত না হলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম রাজনীতিক রূপ ধারণ করতে পারে না। প্রথমে মার্ক্স প্রতিপন্ন করেছেন যে শুরুতে সর্বহারা শ্রেণী ছিল অভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার অর্ন্তভূক্ত ব্যক্তিবর্গের সমাহার অর্থাৎ শুরুতে এই শ্রেণী ছিল 'অনাত্মসচেতন শ্রেণী'(Class in itself)। তারপর সর্বহারা শ্রেণী তাদের শ্রেণীগত স্বার্থ ও রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং এইভাবে সর্বহারা একটি 'আত্মসচেতন শ্রেণী'তে (Class for itself) পরিণত হয়।

টম বটোমোর (Tom Batomore) এই প্রসঙ্গে বলেন, "Marx first distinguishes the proletariat as a 'Class in itself' an aggregate of individuals who are in same economic situation, and then tries to show how it becomes a 'class for itself' , i.e. how its members become aware of their common interest and political aims."

মার্ক্সবাদে শ্রেণীর সংজ্ঞা হিসাবে লেলিনের বক্তব্যকেই গ্রহণ করা হয়। লেলিন তাঁর Great Beginning গ্রন্থে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তির ভুমিকার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতানুসারে শ্রেণী বলতে এক বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে বোঝায়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বতন্ত্র স্থান অনুসারে এই পার্থক্যের সৃষ্টি হয়।

সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব স্থান আছে। শ্রেণীর ধারণা উৎপাদন-প্রকৃতির সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। তা ছাড়া প্রতিটি উৎপাদন পদ্ধতি একটি করে শ্রেণী সৃষ্টি করে। শ্রেণী সম্পর্কিত লেলিনের সংজ্ঞার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হল - ক) শ্রেণী হল ইতিহাস সৃষ্ট। মানব সমাজের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রতিটি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে শ্রেণী অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত। খ) শ্রেণী সামাজিক উৎপাদনে যে ভূমিকার অধিকারী হয় তদনুসারে শ্রেণী বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। গ) শ্রেণী উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটলে, শ্রেণীর কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে। ঘ) শ্রেণী উৎপাদনের উপাদানগুলির সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু এই সম্পর্ক সকল ক্ষেত্রে সমান নয়। শ্রেণী সম্পর্কিত লেলিনের বক্তব্য মূলত পরস্পর-বোরোধী শ্রেণী-বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হয়। তবে এই সংজ্ঞার সাহায্যে গুণগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী সম্পর্কের পরিবর্তন এবং শ্রেণী বিলোপের বিষয়টিও ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

সর্বকালের এবং সর্বপ্রকারের সমাজব্যবস্থায় জীবনধারণের তাগিদে মানুষকে উৎপাদন ব্যবস্থা করতে হয়। উৎপাদনের উপকরণ এবং শ্রমের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় উৎপাদন শক্তির। তবে মানুষের পরিশ্রমই হল প্রধান শক্তি। কিন্তু মানুষ একা নয়, সামাজিকভাবে বা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন করে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এই যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকে বলে উৎপাদন-সম্পর্ক। উৎপাদনের উপাদানগুলিকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয় এই সম্পর্কের। কেউ এই উৎপাদন সমূহের মালিক, আবার কেউ কায়িক শ্রমের দ্বারাই উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে। যে সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ সামাজিক মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে সেখানেই শ্রেণীভেদ থাকে। উৎপাদন-সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থান অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস নির্দিষ্ট হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে উৎপাদন-উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কের মাপকাঠিতে শ্রেণীর পার্থক্য নির্ধারিত হয়। উৎপাদন-উপাদানসমূহকে কেন্দ্র করে উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

লেনিন (Lenin) এই প্রসঙ্গে বলেন, 'The fundamental feature that distinguishes classes is the place they occupy in social production and consequently the relation in which they stand to the means of production`. এইজন্য একই শ্রেণীভুক্ত সকলের কতকগুলি অভিন্ন শ্রেণীস্বার্থ থাকে। তাই এমিলি বার্নস (Emile Burns) এর অভিমত হল ঃ 'একই প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে সমাজের এইরকম এক-একটি অংশ হল এক-একটি শ্রেণী। লেনিন বলেন, শ্রেণীগুলি হল এমন কতকগুলি বৃহৎ জনসমষ্টি যাদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা নির্ভর করে ঐতিহাসিক ধারায় নির্ধারিত একটি সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের স্থান অনুযায়ী, উৎপাদনের উপায় সমূহের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অনুযায়ী, শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা অনুযায়ী এবং এর ফলস্বরূপ সমাজের যে সম্পদ তারা সৃষ্টি করে তার অংশের মাত্রা এবং এই অংশের অর্জনের পদ্ধতির দ্বারা।

মার্কসবাদীরা ‘শ্রেণী’র ধারণাটির দুটি দিকের কথা বলেন। এই দুটি দিক হল ঃ বিষয়গত দিক (objective) অপরটি হল বিষয়ীগত দিক (subjective)। সামাজিক শ্রেণী বলতে যখন ব্যক্তির উৎপাদন কাঠামোগত অবস্থা বোঝানো হয় তখন তা হল শ্রেণীর বিষয়গত ধারণা। যখন ব্যক্তির মানসিক বা আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে তার শ্রেণীর কথা বলা হয় তখন তা হল শ্রেণীর বিষয়ীগত ধারণা। বিষয়গত বিচারে কোন বিশেষ ব্যক্তি শোষিত শ্রেণীর অর্ন্তভূক্ত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মানসিক বা আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, শাসক-শোষক শ্রেণীর সমর্থক হতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রাক্কালে কোন ব্যক্তির আচার-আচরণ অনুসারে সেই ব্যক্তির শ্রেণী চরিত্র জানা যায়। তাই বলা হয় যে, শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে। ফিসার (Fischer) এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘A class is born in class-struggle’.

যে শ্রেণীর হাতে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা থাকে সেই শ্রেণীই উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে। এইভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর ওপর তার প্রভুত্ব কায়েম করে। যে-কোন উৎপাদন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একথা সাধারণভাবে সত্য। তবে উৎপাদন-ব্যবস্থার যদি পরিবর্তন ঘটে, তাহলে সামাজিক সম্পর্ক বদলায়। তার ফলে উৎপাদন-উপাদানের মালিকানা লাভ করে অন্য আর একটি শ্রেণী। বিভিন্ন ধরণের সমাজ-ব্যবস্থায়(আদিম সাম্যবাদী সমাজ বাদ দিয়ে) এই শ্রেণীভেদ বিভিন্ন রকমের হয়। যেমন দাস সমাজে থাকে মালিক শ্রেণী ও দাস শ্রেণী, সামন্ত সমাজে থাকে সমান্ত শ্রেণী ও ভূমিদাস শ্রেণী, বর্জোয়া সমাজে থাকে বুর্জোয়া শ্রেণী ও সর্বহারা শ্রেণী প্রভৃতি।

আদিম সামাবাদী সমাজে শ্রেণীভেদ ছিল না। কারণ এই যুগে মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক সামর্থ্যের পার্থক্য এবং তার ফলে অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত ছিল না। দাস সমাজে সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সামর্থ্যের পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর-বিরোধী দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। দাসসমাজে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তার ফলে শ্রমবিভাগ সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় এক শ্রেণীর মানুষকে কায়িক শ্রমে নিযুক্ত হতে হয়। এরা হল দাসশ্রেণী। আর অল্প সংখ্যক কিছু ব্যক্তি পরিশ্রমভোগী শ্রেণীতে পরিণত হল; এরা দাস-মালিক শ্রেণী। প্রতিটি শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে পরস্পর-বিরোধী দুটি মুখ্য শ্রেণী ছাড়াও কতকগুলি গৌণ শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়।

দাস-সমাজে দাস-মালিক ও দাসশ্রেণী - এই দুটি মুখ্য শ্রেণী ছাড়াও ছিল কারিগর, স্বাধীন কৃষক ইত্যাদি অন্যান্য গৌণ শ্রেণীও। আবার এমিলি বার্নসের মতে 'অনুন্নত দেশগুলিতে এখনও উদীয়মান পুঁজিপতি শ্রেণী এবং উদীয়মান শ্রমিক শ্রেণীর পাশাপাশি ভূস্বামী এবং ভূমিদাসের অনুরূপ কৃষকদের দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রেণীসংহতি ঃ সমাজে শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে মার্কস তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই তিনটি বিষয় হল ঃ শ্রেণীসংহতি, শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীসংগ্রাম। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টি হয় ঐক্য ও সংহতি। একেই বলা হয় শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীসংতি (class solidarity)। শ্রমিক হিসাবে সকলে উৎপাদন ব্যবস্থায় সমভাবে শোষিত হয়। এই কারণে কার্ল মার্কস এদের বিশেষ একটি শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

শ্রেণীচেতনা ঃ সামাজিক শ্রেণী হিসাবে চিহ্নত হওয়ার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে 'শ্রেণীচেতনা' (class consciousness) আবশ্যক। কার্ল মার্কসের অভিমত অনুযায়ী শ্রেণীচেতনা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকদের প্রকৃত অর্থে শ্রেণী হিসাবে অভিহিত করা যায় না। বহিরাবরণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ কোন সামাজিক শ্রেণীর যথার্থ পরিচয় হিসাবে প্রতিপন্ন হয় না। বস্তুত শ্রেণীচেতনা হল একটি শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। বিশেষ একটি শ্রেণীর অর্ন্তভূক্তি সম্পর্কিত যে চেতনা তাকেই বলে 'শ্রেণীচেতনা'। মূলতঃ শ্রমিক শ্রেণীর পরিপ্রেক্ষিতেই মার্কস শ্রেণীচেতনার কথা বলেছেন।

কতকগুলি বিষয়ে শ্রমিকরা হল ভুক্তভোগী ও সচেতন। এই সকল বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের ভূমিকা, মালিকদের সাথে সম্পর্কের প্রকৃতি, শ্রমিকদের বঞ্চিত করে মালিকদের উদ্বৃত্তমূল্য আত্মসাৎ প্রভৃতি। এই সকল বিষয়ে সচেতনতার ফলস্বরূপ শ্রমিকরা একাত্মতার ভিত্তিতে একটি বিশেষ শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এইভাবে তারা পুঁজিবাদী মালিক শ্রেণীর মুখোমুখি হয়।

শ্রেণীসংগ্রাম ঃ যে উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজকে শ্রেণীবিভক্ত করে তাই আবার শ্রেণী-সংঘর্ষেরও সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর-বিরোধী দুটি শ্রেণীর অবস্থান শ্রেণী দুটির স্বার্থের ভিতরে সংঘাতকে অনিবার্য করে তোলে। বস্তুত বিপরীতমুখী স্বার্থের অস্তিত্বের কারণেই বিত্তবান শ্রেণী ও মেহনতী শ্রেণীর মধ্যে অবিরাম ‘শ্রেণীসংগ্রাম’ (class struggle) লেগে থাকে।

শ্রেণীভেদ, শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান ঃ আদিম সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। এই কারণে তখন কোন শ্রেণীভেদ বা শ্রেণীদ্বন্দ্ব ছিল না। তবে দাস-সমাজ থেকে শুরু করে পরবর্তী পর্যায়ে সকল সমাজই হল শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ। এই সকল সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রেণী-সংঘাত অনিবার্যভবে পরিলক্ষিত হয়। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর প্রথম ও প্রধান বক্তব্য হল ঃ 'আজ অবধি যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস'। তবে এখানে কেবলমাত্র শ্রেণী-বিভক্ত সমাজসমূহের কথা বলা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। তখন উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন রকম পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীস্বার্থ থাকে না। উৎপাদন উপকরণের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বৈষম্য বিলুপ্ত হয়। এইভাবে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটে। তখন মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটে। আর এইভাবে অবসান ঘটে শ্রেণীভেদ, শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের। তার ফলে সৃষ্টি হয় সাম্যবাদী সমাজের।

শ্রেণী সম্পর্কীয় মার্কসীয় তত্ত্বের সমালোচনা ঃ

শ্রেণী সম্পর্কে মার্কসবাদী তত্ত্বের নানান সমালোচনা সমাজ দর্শনে লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বিকদের মধ্যে যারা মার্কসবাদ-বোরোধী তাঁরা শ্রেণীসংক্রান্ত মার্কসীয় তত্ত্বের নানাভাবে সমালোচনা করেছেন। মার্কসীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধ মতগুলি আমরা নিম্নরূপভাবে আলোচনা করতে পারি।

১) মার্কসবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকগণ শ্রেণীকেন্দ্রিক বিশ্লেষণধারায় বিশ্বাস করেন না। তাঁরা সামাজিক স্তরবিন্যাস ও সামাজিক সচলতার কথা বলেন। শোষক শ্রেণী অথবা শোষিত শ্রেণীর অর্ন্তভূক্ত হয়ে থাকাটা কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট থাকে না। আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজে সামাজিক সচলতার ক্রিয়া বা প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ। এখনকার মুক্ত সমাজে এই সামাজিক সচলতার গতিও বেশ লক্ষণীয়। এই অবস্থায় একটি সামাজিক স্তর থেকে অন্য একটি সামাজিক স্তরে ব্যক্তিবর্গের গমনাগমনের সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকে।

২) বর্তমানে মর্যাদাভিত্তিক গোষ্ঠী হিসাবেও শ্রেণীর ধারণাকে ব্যাখ্যা করা হয়। সমাজতত্ত্ববিদ্ টম্ বটোমোর (T. B. Bottomore) মর্যদাভিত্তিক ক্রমস্তরবিন্যস্ত এক সামাজিক কাঠামোর ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতানুসারে বর্তমানে শ্রেণীচেতনার প্রসার বহুলাংশে রুদ্ধ হয়েছে। এর কারণ হিসাবে তিনি মর্যদাভিত্তিক গোষ্ঠীর বিকাশ ও বিস্তারের কথা বলেছেন। বিভিন্ন স্তরে এই সকল গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিরোধিতার নয়। এই সম্পর্ক হল প্রতোযোগিতার।

৩) অ-মার্কসবাদী চিন্তাবিদ্‌দের অভিমত অনুসারে শ্রেণী ও শ্রেণীচেতনার থেকে জাতীয় ভাব বা জাতীয়তাবাদের ক্রিয়া অধিক শক্তিশালী। কিন্তু মার্কসবাদে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধ এবং জাতীয়তাবাদের কার্যকর প্রভাবকে উপেক্ষা করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে জাতিসমূহের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রভাব ক্রমবর্দ্ধমান। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। তাই দেখা যায় যে সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণ এবং কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সরকারের যুদ্ধ আয়োজনকে সমর্থন জানায়। দেশ ও জাতির প্রতি মানুষের আনুগত্য প্রবল হয়। এই আনুগত্যের ভিত্তিতে শ্রেণী-স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে মানুষ সংগ্রামে সামিল হতে পারে। এই কারণে সমালোচকদের অভিমত হল এই যে, মার্কসবাদে কেবল শ্রেণী-দ্বন্দ্ব ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ কার হয় এবং বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করা হয়।

৪) মার্কসীয় মতবাদে শ্রেণীবিন্যাসের একমাত্র কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু এই তত্ত্ব সর্বাংশে সত্য নয়। শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য হল বাহ্য কারণমাত্র। শ্রেণী-চেতনাই হল এক্ষেত্রে মুখ্য বিষয়। এই শ্রেণী-চেতনার ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয় শ্রেণী-সংহতির। অর্থনীতির সাথে সম্পর্করহিত শ্রেণীবিন্যাসও মানব-সমাজে লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে ম্যাকাইভার ও পেজ প্রদত্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। তাঁরা বলেন, হিন্দুদের সামাজিক কাঠামোতে বিত্তশালী বৈশ্যদের তুলনায় দরিদ্র ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদা অনেক বেশী উন্নত। তাছাড়া মার্কসীয় দর্শনে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী-সংঘাতের কথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে অর্থনৈতিক স্বার্থ ব্যতিরেকেও অন্যান্য নানাকারণে সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

৫) সমালোচকদের মতে শ্রেণী-বিন্যাস সম্পর্কিত মার্কসের তত্ত্ব অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট। মার্কসবাদে সকল সমাজব্যবস্থায় পরস্পর-বিরোধী দুটি শ্রেণীর অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ম্যাকাইভার ও পেজের মতে, মার্কসীয় তত্ত্বে উল্লিখিত দুটি শ্রেণী ভিন্ন মধ্যবর্তী বিভিন্ন শ্রেণীও বর্তমান। এই সকল শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী-চেতনাও বর্তমান। কিন্তু এই শ্রেণীগুলিকে মার্কসীয় দ্বিবিধ শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে ফেলা যায় না। বাস্তবে বিত্তবান ও বিত্তহীন শ্রেণী বা শোষক ও শোষিত এই দুটি শ্রেণীই সব নয়। এই দুটি শ্রেণী ছাড়াও বিভিন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থান অনস্বীকার্য। অনেক সময় এই সকল মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ইংরেজীতে বলা হয় 'White color worker'। সঠিক অর্থে এরা শ্রমিক নয়, আবার এদের পুঁজিপতিও বলা যায় না। এদের অবস্থান হল এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী পর্যায়ে। এরা জীবিকা নির্বাহ করে বেতনভুক কর্মচারী হিসাবে।

৬) আবার কোন কোন সমালোচকদের মতে এখন আর সমাজে দুটি শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতার সম্পর্ক দেখাই যায় না। এখন আর সমাজে বুর্জোয়া বা প্রলেতারিয়েত শ্রেণী নাই বললেই চলে। আছে একটি মাত্র শ্রেণী। তা হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই অবস্থায় শ্রেণী-সংগ্রামের ধারণা অচল। বরং অধ্যাপক জিসবার্ট শ্রেণী-ব্যবস্থায় মার্কসীয় তত্ত্বকে উড়িয়ে দিয়ে জীবন যাত্রার মানের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা ক) উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত।

৭) বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় দুনিয়ার সকল শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য তেমন একটা লক্ষ্য করা যায় না। তাদের মধ্যে মানসিকতা, মনোভাব ও স্বার্থগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আর এর ফলে শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক শ্রেণী-সম্পর্কের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বর্তমানে সকল শ্রমিককে অভিন্ন শ্রেণীর অর্ন্তভূক্ত করে প্রলেতারিয়েত আখ্যা দেওয়া যায় না। অনুরূপভাবে আবার সকল পুঁজিপতিকেও একই শ্রেণীভূক্ত ভাবা ঠিক নয়। ছোট ছোট পুঁজিপতি ও বড় বড় পুঁজিপতিরা এক শ্রেণীভূক্ত নয়। এই দুই পুঁজিপতিদের স্বার্থ অনেক সময় পরস্পর-বিরোধী হয়। তাই এদেরও এক শ্রেণীর অর্ন্তভূক্ত করা যায় না।

৮) অ-মার্কসবাদী সমাজবিদদের মতে শ্রেণীহীন সমাজ বাস্তবে সম্ভব নয়। শ্রেণী-সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে মার্কসবাদীরা সর্বহারা শ্রেণীর জয়লাভ ও শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অতিমাত্রায় আশাবাদী। কিন্তু বাস্তবে সর্বহারা শ্রেণীর জয়লাভের পরেও নতুন এক সুবিধাবাদী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটতে পারে। তারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অংশীদার বা যন্ত্রবিদ্ বা পরিচালক হতে পারে।

৯) কার্ল মার্কস পঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার ক্রম-অবনতি ও অমানবিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। কিন্তু বাস্তবে এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিক শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে আগের তুলনায় শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার ও জীবনযাত্রার মানের উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি হয়েছে। সমাজ দার্শনিক জিসবার্টের অভিমত অনুসারে বর্তমানে বিভিন্ন সমাজকল্যাণ ও শ্রমিক-কল্যাণমূলক আইন প্রণীত হয়েছে। তাছাড়া শক্তিশালী শ্রমিকসংঘ ও শ্রমিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। আর এসবের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থার প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

১০) মার্কসবাদে রাষ্ট্রকে শ্রেণী-শোষণের হাতিয়ার হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র হল জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। সুতরাং এখন আর রাষ্ট্রকে শ্রেণী-শোষণের যন্ত্র বা হাতিয়ার বলা যাবে না।

১১) গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন হল একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। এখানে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু এখানে সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাস লোপ পেয়েছে এমন দাবী করা যায় না। এখানে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন দাবী অচল। চীনের গ্রামাঞ্চলের একজন সাধারণ কৃষক এবং শহরাঞ্চালের একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার কোনভাবেই সমসামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন নয় এবং স্বভাবতই অভিন্ন শ্রেণীর অর্ন্তভূক্তও নয়।

তবে এতসব সমালোচনা সত্ত্বেও শ্রেণী সম্পর্কিত মার্কসীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যার গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কিত মার্কসীয় মতবাদের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যকে একেবারে অস্বীকার করা অসম্ভব।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ